ইউজিসির ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র বাস্তবায়নের এক দশক
সর্বগ্রাসী অক্টোপাসের কবলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়

নাঈমা খালেদ মনিকা

পাবলিক বা সর্বজন বিশ্ববিদ্যালয় সর্বগ্রাসী মুনাফা কেন্দ্রিক তৎপরতায় আক্রান্ত। বিশ্বব্যাংক যে পথ তৈরি করে দিয়েছে সেই পথেই সরকারের পর সরকার হাঁটছে, হাঁটছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। শিক্ষা ও গবেষণা গৌণ, বাণিজ্যই সেখানে প্রধান। এর শিকার শিক্ষা এবং শিক্ষার্থী। কীভাবে? এই বিষয়টিই এই প্রবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

আজকের অবস্থা দেখলে মনে হয়, বছর বছর সার্টিফিকেট দেয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র কাজ। অথচ জ্ঞান সৃষ্টি, জ্ঞান সংরক্ষণ, জ্ঞান বিতরণ–এই তিন শর্তই বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা করেছে। আর এই জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষেত্রটি কেমন হবে? এ প্রসঙ্গে সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদের 'বিশ্ববিদ্যালয়' সম্পর্কিত বক্তব্য স্মরণযোগ্য। তিনি বলেছিলেন, "প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় লালন করে দ্বৈত আনুগত্য; তার আনুগত্য নিজের সমাজের প্রতি ও বিশ্বমানবের প্রতি। যে সমাজ পালন করছে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে, তার প্রতি যে বিশেষ কর্তব্য আছে বিশ্ববিদ্যালয়ের, তা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আপন সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালনের সুবিধার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়কে দিতে হয় এমন বিশেষ কিছু সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার যা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে দায়িত্ব পালন অসম্ভব। এমন বিশেষ অধিকার অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় নয়, কিন্তু একান্ত প্রয়োজনীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের। তাই বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েও এক স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। স্বতন্ত্র রাষ্ট্রত্ব বিশ্ববিদ্যালয়ের দোষ নয়, গুণ। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব রয়েছে সমস্ত সভ্যতা ও মানবমণ্ডলীর প্রতিও। বাংলা 'বিশ্ববিদ্যালয়' শব্দটির আক্ষরিক তাৎপর্য অনুধাবনযোগ্য; এটি বিশ্বের বিদ্যালয়, এখানে চর্চা হয় বিশ্বজ্ঞান। জ্ঞানের বিচিত্র রূপ ও বহুমুখী বিকাশের এলাকা বিশ্ববিদ্যালয়" (আজাদ, ১৯৯৯)

এখন প্রশ্ন হলো, আমাদের রাষ্ট্র কি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত এই ধারণাকে মেনে নিয়েছে? কোন নীতিতে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে চালানোর চেষ্টা করছে? আর এই পথ ধরে হাঁটলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিণতি অদূর ভবিষ্যতে কী হতে যাচ্ছে?

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে রাষ্ট্রের মহাপরিকল্পনা

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পরিচালনা করার জন্য সরকার ২০০৬ সালে বিশ্বব্যাংকের পরামর্শে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন 'উচ্চশিক্ষার কৌশলপত্র : ২০০৬-২০২৬' (Strategic Plan for Higher Education: 2006-2026) নামে একটি মহাপরিকল্পনা হাজির করে। আমাদের আলোচ্য নিবন্ধ এই পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে লিখিত। প্রথমে কৌশলপত্রের চুম্বক অংশগুলো তুলে ধরছি। কৌশলপত্র ইংরেজিতে লিখিত হলেও পাঠের সুবিধার্থে বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া হয়েছে।

- সরকার আগামী ২০ বছরে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ব্যয়ের ক্ষেত্রে তার বরাদ্দের অংশ ৯০% থেকে কমিয়ে ৭০% এ হ্রাস করার পরিকল্পনা করতে পারে।
- অর্থায়নের শূন্যতা হ্রাস করার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব অর্থের উৎস তৈরি করা উচিত।
- বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে টিউশন ও ছাত্রঋণের প্রকল্প প্রবর্তন করতে হবে। (কৌশলপত্র ২০০৬ : ৭১, অংশ ৩, অধ্যায় ১)।
- অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির কয়েকটি খাতের মধ্যে রয়েছে ছাত্র বেতন বৃদ্ধি, আবাসন ও ডাইনিং চার্জ বৃদ্ধি, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্থাপনা ভাড়া দেয়া, ক্যাফেটেরিয়া ভাড়া, কনসালটেন্সি সার্ভিস, বিশ্ববিদ্যালয় বীমা ইত্যাদি (কৌশলপত্র ২০০৬ : ২৯, অংশ ২, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ৮.৪)।
- চাকরি বাজারের চাহিদা অনুযায়ী ছাত্রসংখ্যা, বিষয়বস্তু এবং সিলেবাস নির্ধারিত হবে এবং এর ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেট নির্ভর করবে (কৌশলপত্র ২০০৬ : ২৮, অংশ ২, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ৮.৩)।
- ঐতিহাসিকভাবে, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে যে মানবিক ও প্রকৃতি বিজ্ঞান পড়ানো হয় তার সঙ্গে বর্তমান চাকরি বাজার বা বাস্তব জীবনধারণের সম্পর্ক খুবই কম। ইতিমধ্যে গত কয়েক বছরের জ্ঞান-বিজ্ঞানের শাখায় অনেক পরিবর্তন ঘটেছে (কৌশলপত্র ২০০৬ : ১৩, অংশ ১, অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ৩.৩)।
- স্থানীয় ও বৈশ্বিক চাহিদাসমূহ পূরণের লক্ষ্যে ব্যবহারিক জ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ব্যবসায় ও বাণিজ্যের মতো বিষয়গুলোতে ছাত্র সংযোগ বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে (কৌশলপত্র ২০০৬ : ১৩, অংশ ১, অধ্যায় ৩, অনুচ্ছেদ ৩.৩)।
- প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ থেকে বোঝা যায় কিছুসংখ্যক প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সম্ভাবনাময়। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বাড়লে পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়বে, ফলে শিক্ষার মানোন্নয়ন ঘটবে (কৌশলপত্র ২০০৬ : ৩০, অংশ ২, অধ্যায় ১০)।
- আবাসিক হলের ব্যবস্থা ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় (কৌশলপত্র ২০০৬, Executive Summary অংশ)।
- বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও সিন্ডিকেটের মতো বিভিন্ন প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে এবং উপাচার্য নিয়োগের ভূমিকা রাখার মধ্য দিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিশ্ববিদ্যালয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে (কৌশলপত্র ২০০৬ : ২০, অংশ ২, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ১)।
- মঞ্জুরি কমিশনকে 'উচ্চশিক্ষা কমিশন' নামে নামকরণ করা যেতে

পারে। এটি কমিশনকে একটি ভালো ভাবমূর্তি দেবে এবং কর্তৃত্ব ও ভূমিকাকে শক্তিশালী করবে (কৌশলপত্র ২০০৬ : ২১, অংশ ২, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ৩)।

দেখা যাক, বিগত ১০ বছরে এই প্রকল্পের বাস্তবায়ন কত দূর হয়েছে এবং এর ফলাফলটা ঠিক কেমন। আর এই কৌশলপত্র বাস্তবায়িত হলে বিশ্বব্যাংক গোষ্ঠীর লাভ কী?

বেতন-ফি বৃদ্ধি

কৌশলপত্রে প্রস্তাব করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা বাড়ানোর। অভ্যন্তরীণ আয় কথাটার অর্থ হলো, রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ কমানো হবে, বছর বছর বাড়বে শিক্ষার্থীদের বেতন-ফি। ইউজিসির ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্রের ভিত্তিতে গত ১০ বছরে উচ্চশিক্ষায় ফির বোঝা কত গুণ বেড়েছে তা দেশের প্রধান কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চিত্র থেকে বোঝা যাবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০০৪-০৫ সেশনে কলা ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, বাণিজ্য অনুষদ, বিজ্ঞান অনুষদ, আইইআরে প্রথম বর্ষে ভর্তি ফি ছিল যথাক্রমে ৩১৮৫ টাকা, ৪১৮১ টাকা, ৩২৭০ টাকা, ২৫৫০ টাকা। এখন এসে তা দাঁড়িয়েছে বিভাগ ও হলভেদে ১০-১১ হাজার থেকে ১৮-১৯ হাজার টাকায়। এমনকি টেলিভিশন ফিল্ম অ্যান্ড ফটোগ্রাফি বিভাগে চার বছরের অনার্স কোর্সের ফি নির্ধারিত হয়েছে ১ লাখ ৩৭ হাজার টাকা।

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১১ সালে ভর্তি ফি ছিল ১৮২৫ টাকা। ২০১২ সালে তা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬২১৪ টাকা। সেমিস্টার ফি করা হয়েছে ১২০০ টাকা। ফরম ফিলআপ ফি ৩০০ থেকে ১৭৮০ টাকা করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি ফরমের মূল্য ৬০০ থেকে বাড়িয়ে ৮০০ টাকা করা হয়েছে।

নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমুদ্রবিজ্ঞান বিভাগে ভর্তি ফি ২৫৫০০ টাকা। কুমিলা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ফি ১৫৫৬০ টাকা। বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৮ সালে ভর্তি ফি ছিল ৪৫০০ টাকা; বর্তমানে ৫০০০ টাকা বৃদ্ধি করে ৯৫০০ টাকা করা হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাজেটে ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছক-১ এ দেয়া হলো।

ছক-১: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বর্ষের আভ্যন্তরীণ উৎস থেকে আয়

শিক্ষাবর্ষ	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
অভ্যন্তরীণ আয় (কোটি টাকায়)	১৪.৫০	১৮.৭৮	২৫.০০	২৫.৭৫	৩০.০০	৩২ (সংশোধিত)	২৯.৬১	৩২.২৮	৩৯.৪১	৩৯.৫০	৪১.০০

এই অভ্যন্তরীণ আয়ের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্যই প্রতিবছর বাড়ছে ছাত্র বেতন, বাড়ছে আবাসন, পরিবহনসহ অন্যান্য ফি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শুধুমাত্র জগন্নাথ হলের আবাসিক ছাত্রদের জন্য বিভিন্ন ফি কিভাবে বাড়ানো হয়েছে তা ছক-২ এ তুলে ধরা হলো–

অর্থাৎ প্রতিবছর নতুন নতুন খাত যুক্ত হচ্ছে আর পুরনো খাতগুলোতেও টাকা নেয়া হচ্ছে কোনোটার দ্বিগুণ, কোনোটার তিন গুণ। প্রতিবছর রাষ্ট্রের মোট বাজেটের তুলনায় উচ্চশিক্ষায় বরাদ্দ আনুপাতিক হারে কমছে।

ছক ২ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের বিভিন্ন বর্ষের ফি বৃদ্ধির চিত্র

ফি প্রদানের খাত	২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষ	২০১৫-১৬ শিক্ষাবর্ষ
হল স্থাপনা চাঁদা	৭২০ টাকা	২০০০ টাকা
পূজা তহবিল	৪০০ টাকা	১২০০ টাকা
দরিদ্র তহবিল	২০০ টাকা	৪০০ টাকা
হল জামানত ফি	৫০ টাকা	১০০ টাকা
খেলাধুলা সংক্রান্ত ফি	-------	৪০০ টাকা
কম্পিউটার ল্যাব ফি	-------	৮০০ টাকা
চিকিৎসা তহবিল	-------	৪০০ টাকা
সর্বমোট	১৩৭০ টাকা	৫৩০০ টাকা

কিন্তু এই ফি বৃদ্ধির ফলাফল কী? সাদা চোখে দেখলেও সবাই বুঝবে, এই ফি বৃদ্ধি ছাত্রদের পক্ষে শিক্ষাগ্রহণের পথে বাধাস্বরূপ। এখন শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাওয়াটাই তো বড় কথা নয়। নিম্নবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা কোনো শিক্ষার্থী সামাজিকভাবে অপদস্থ হয়ে, ধারদেনা করে কিংবা জমিজমা বিক্রি করে কিংবা ঋণগ্রস্ত হয়ে ভর্তি ফির ধাক্কাটা হয়তো সামলে নেয়। তার পরও তার সামনে দীর্ঘ পথ বাকি থাকে। প্রতিবার সেমিস্টার ফি, পরীক্ষার ফি কিভাবে জোগাড় হবে তা অধিকাংশকেই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। ফলে দু-তিনটা টিউশন করা নয়তো কোচিংয়ে ক্লাস নেয়া অথবা খণ্ডকালীন চাকরি করতে হয়। টাকা জোগাড়ের এই মানসিক চাপের পাশাপাশি হলের নিম্নমানের খাবার খেয়ে আর গণরুমে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে থেকে পড়াশোনায় মনোযোগ দেয়া কঠিন।

যাঁরা ফি বৃদ্ধির পক্ষে যুক্তি তোলেন, তাঁদের অনেকেই বলেন যে সব কিছুর দাম বাড়ছে, তাহলে উচ্চশিক্ষার খরচ বাড়বে না কেন? প্রশ্ন হলো, শিক্ষা কি বাজারের পণ্য হওয়া উচিত? শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার। অন্য দশটা ক্ষেত্রে জীবনযাপনের ব্যয় বেড়েছে বলেই তো পড়াশোনার খরচ আরো কমানো প্রয়োজন। থাকা, খাওয়া, দৈনন্দিন খরচে যদি একজন শিক্ষার্থীর ৫০০০ টাকার ওপরে চলে যায়, তাহলে আমাদের মতো দেশের কয়টি পরিবার তা দিতে সক্ষম? আজ যাঁরা ফি বৃদ্ধির পক্ষে যুক্তি তুলছেন, তাঁদের অনেকেই হয়তো উচ্চশিক্ষার দোরগোড়া পর্যন্ত আসতেই পারতেন না, যদি রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব না নিত। আজ তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাঁরাই বড় আমলা। তাঁরাই শিক্ষার্থীদের কাঁধে কিভাবে অতিরিক্ত ফির বোঝা চাপানো যায় সেই পরিকল্পনা করছেন।

ইভনিং/ নাইট কোর্স এবং উইকেন্ড বাণিজ্য

সবার এখন জানা যে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন দিনে এক চরিত্র, রাতে আরেক চরিত্র। দিনের বেলা সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'নিয়মিত'

ছাত্ররা পড়ে। আর সন্ধ্যাবেলা সেখানে বাইরের শিক্ষার্থীরা বেশি টাকা দিয়ে পড়ে একটা সার্টিফিকেটের জন্য, যেটাকে বলা হয় নাইট কোর্স বা ইভিনিং কোর্স বা উইকএন্ড কোর্স ইত্যাদি। কৌশলপত্রের পরামর্শ অনুযায়ী, বাংলাদেশের বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নাইট কোর্স চালু হয়েছে গত ১০ বছরে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি, সরকার ও রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল ও পরিবেশ, আইবিএ, আইআইই, বিবিএ, সিএসই বিভাগে উইকএন্ড কোর্স চালু আছে। সকল বিভাগেই উইকএন্ড কোর্স খোলার নীতিগত সিদ্ধান্ত একাডেমিক কাউন্সিলে পাস হয়েছে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন অনুষদ, বিবিএ, অর্থনীতি বিভাগে বাণিজ্যিক নাইট কোর্স চালু আছে। অন্যান্য বিভাগে নাইট কোর্স চালুর ব্যাপারে তৎপরতা চলছে। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি অনুষদের ৩২টি বিভাগে ও ছয়টি ইনস্টিটিউটে বাণিজ্যিক নাইট কোর্স/প্রফেশনাল কোর্স চালু রয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩টির বেশি বিভাগে বাণিজ্যিক নাইট কোর্স চালু হয়েছে। প্রথম দিকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ রকম কোর্স চালু যে রকম দৃষ্টিকটু ছিল, এখন আর তা নেই। বরং শিক্ষকদের মধ্যে কে কিভাবে ক্লাস নিয়ে অতিরিক্ত অর্থ আয়ের পথ করবে তার জন্য রয়েছে কাড়াকাড়ি। নাইট কোর্সের পক্ষে শিক্ষকদের মুখে যুক্তিও শোনা যায়। যুক্তিগুলো এ রকম–

নাইট কোর্স চালুর মাধ্যমে অধিকসংখ্যক শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পাবে। নাইট কোর্স বা ডিপ্লোমা কোর্স চালু হলে বিভাগের কিছু উন্নতি হবে। বিশেষত টাইলস লাগানো, রুমসজ্জা, এসি লাগানো যাবে। শিক্ষকদের বেতন পর্যাপ্ত নয়। যদি নিজস্ব ক্যাম্পাসেই কোর্স খুলে পয়সা আয় করা যায় তাহলে তো আর শিক্ষকদের বাইরে যেতে হবে না। বিশাল অবকাঠামো পড়ে থাকে। এটাকে কাজে লাগিয়ে বিভাগ বা শিক্ষকদের দু পয়সা আয় হলে মন্দ কি? ইত্যাদি ইত্যাদি...

শিক্ষাবিস্তারই যদি নাইট কোর্সের উদ্দেশ্য হয় তাহলে কোর্সগুলোতে এত বিপুল অঙ্কের ফি রাখার কী প্রয়োজন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভিনিং এমবিএ করতে এখন খরচ লাগে দুই লাখ ৬৪ হাজার টাকা। এত টাকা দেয়ার সামর্থ্য কোন স্তরের শিক্ষার্থীদের আছে? বিভাগের উন্নয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন থেকে পৃথক কিছু না। বিভাগের উন্নয়নের জন্য যা অর্থের প্রয়োজন, তা বিশ্ববিদ্যালয় দেবে। আর বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ দেবে রাষ্ট্র। যাঁরা বিকেলের পর অবকাঠামো ব্যবহারের কথা বলেন তাঁদের জানা দরকার, বিশ্ববিদ্যালয় একটি ২৪ ঘণ্টার প্রতিষ্ঠান। এখানকার শিক্ষক মানে তিনি শুধু ক্লাস নিয়ে চলে যাবেন–ব্যাপারটি মোটেও তা নয়। ক্লাসের প্রস্তুতি, গবেষণা, শিক্ষার্থীদের সাথে যুক্ত হবার জন্য তাঁর সময় প্রয়োজন। সেটি না করে অর্থের পেছনে ছুটলে সচ্ছলতা হয়তো আসে, বিভাগও হয়তো বাহ্যিকভাবে কিছুটা দৃষ্টিনন্দন হয়; কিন্তু সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পিছিয়ে যায়।

উচ্চশিক্ষার কৌশলপত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ আয়ের উৎস হিসেবে বিভিন্ন স্থাপনা, ক্যাফেটেরিয়া ভাড়া দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। এই কয়েক বছরেই অবকাঠামোর বাণিজ্যিক ব্যবহার ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলের খেলার মাঠ দিনপ্রতি এক লাখ টাকায় ভাড়া দেয়া হয়। ছক-৩ এ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নাইট এবং উইকেন্ড কোর্স ছাড়াও কী কী স্থাপনা ভাড়া পাওয়া যায় তার চিত্র তুলে ধরা হলো–

ভাড়া দেয়ার হিড়িক দেখলে মনে হবে যে টিএসসি, অডিটরিয়াম, জিমনেসিয়াম কিংবা খেলার মাঠ–কোনোটাই শিক্ষার্থী-দের জন্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। অথচ সবারই জানা আছে, ছাত্র-শিক্ষক পারস্পরিক বিনিময়ের জন্য ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র প্রয়োজন, হলগুলোর সাথে খেলাধূ-লার জন্য বড় মাঠ প্রয়োজন। হলের সাথে বড় পুকুর প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মঞ্চ প্রয়োজন। আলোচনা সভা, সেমিনারের জন্য হলরুম প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক চর্চা আর মত প্রকাশের জন্য সভাস্থল প্রয়োজন। এর সবই প্রয়োজন শিক্ষার্থীদের জন্য, উচ্চশিক্ষার জন্য। এই প্রয়োজন খণ্ডকা-লীন বা সাময়িক নয়, সার্বক্ষণিক প্রয়োজন। শিক্ষার্থীরা যদি এসব চর্চার মধ্যে থাকে তাহলে যে অবকাঠামো আছে তাই অপ্রতুল। কারণ অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রসংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু অবকাঠামো সেই তুলনায় বাড়েনি। তাই শিক্ষার্থীদের যথাযথ সুযোগ দিলে অবকাঠামোর বাণিজ্যিক ব্যবহারের সুযোগই নেই। বাণিজ্যিক কোম্পানির মতো কোথা থেকে টাকা আয় করা যায় এটাই যখন কর্তৃপক্ষের মুখ্য ভাবনা হয়ে যায়, ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তোলার দায়বোধ কি অনুভব করা সম্ভব?

> নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসা কোনো শিক্ষার্থী সামাজিকভাবে অপদস্থ হয়ে, ধারদেনা করে কিংবা জমিজমা বিক্রি করে কিংবা ঋণগ্রস্ত হয়ে ভর্তি ফির ধাক্কাটা হয়তো সামলে নেয়। তার পরও তার সামনে দীর্ঘ পথ বাকি থাকে। প্রতিবার সেমিস্টার ফি, পরীক্ষার ফি কিভাবে জোগাড় হবে তা অধিকাংশকেই তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়।

> আজ যাঁরা ফি বৃদ্ধির পক্ষে যুক্তি তুলছেন, তাঁদের অনেকেই হয়তো উচ্চশিক্ষার দোরগোড়া পর্যন্ত আসতেই পারতেন না, যদি রাষ্ট্র সেই দায়িত্ব না নিত। আজ তাঁরাই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, তাঁরাই বড় আমলা। তাঁরাই শিক্ষার্থীদের কাঁধে কিভাবে অতিরিক্ত ফির বোঝা চাপানো যায় সেই পরিকল্পনা করছেন।

ব্যবসায়ীদের হাত

ইউজিসির কৌশলপত্র পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অনুপ্রবেশের প্রস্তাব দিয়েছিল। গত ১০ বছরে তার ব্যাপক বাস্তবায়ন ঘটেছে। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) তারই একটি অংশ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাণিজ্যিক কোম্পানির অনুপ্রবেশ এখন খুবই সাধারণ ব্যাপার। বড় বড় সেমিনার হল, ল্যাব, ক্যান্টিন তো বটেই, কোনো বিভাগের হয়তো বিশুদ্ধ পানির ফিল্টার লাগবে, কিংবা পিকনিক হবে, হলের গেট লাগবে, গেটে লাইট লাগবে–সেটার জন্যও কোনো না কোনো বাণিজ্যিক কোম্পানির নাম ও লোগো ব্যবহার করতে হবে। পরিস্থিতি এখন এতটাই নাজুক। শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কোন কোম্পনির সাথে সম্পর্ক তা একনজরে দেখলে এটাই মনে হবে যে এটা কি বিশ্ববিদ্যালয়, নাকি বিজ্ঞাপনের বাজার যেমন:

- ফার্মেসি অনুষদে **COLORCON** কোম্পানির আর্থিক সহায়তায় এক কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে ট্যাবলেট কোটিং ল্যাবরেটরি স্থাপন। অ্যারিস্টোফার্মা লিমিটেডের অর্থায়নে আট লাখ টাকা ব্যয়ে ফার্মেসি অনুষদে MICROPLATE READER নির্মাণ।
- প্রাইম ব্যাংক ও পূবালী ব্যাংকের অর্থায়নে উন্নয়ন অর্থায়ন বিভাগে কম্পিউটার স্থাপন ও ইন্টারনেট সংযোগ চালু। সেন্টার অব এক্সেলেন্স ভবন নির্মাণের জন্য ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের ১০ কোটি টাকা অনুদান।

ছক-৩: বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো ভাড়া

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়	দোকান ভাড়া–বটতলা, ট্রান্সপোর্ট, টারজান পয়েন্ট, ডেইরি, প্রান্তিক, বিশমাইল, রফিক জব্বার হল, সালাম বরকত হল। ক্যাফেটেরিয়া ভাড়া, অডিটরিয়াম ভাড়া, পিকনিকের জন্য ফি, লেক লিজ দেয়া, মোবাইল কোম্পানির টাওয়ার বসানো, বিভিন্ন কোম্পানির বিজ্ঞাপনের সুযোগ প্রদান ইত্যাদি ।
হাজী দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়	আম, লিচু বাগান বর্গা দেয়া, টিএসসি ভাড়া, অডিটরিয়াম ভাড়া, পুকুর লিজ দেয়া হয় ।
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়	পুকুর–মাছ ধরার টিকিট বিক্রি হয় বছরে তিনবার, তিনটি মিলনায়তন, দুটি মার্কেট ভাড়া দেয়া হয় ।
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়	ক্লাসরুমের বাণিজ্যিক ব্যবহার ।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	খেলার মাঠ, জিমনেসিয়াম, ডরমিটরি, কনফারেন্স রুম, টিএসসি, বিভিন্ন একাডেমিক ভবনে ও হলের ছাদে মোবাইল কোম্পানির টাওয়ার, বিভিন্ন মোড়ে বিজ্ঞাপনী কোম্পানির বিলবোর্ড, দোকান ভাড়া দেয়া হয়।

- ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্ট বিভাগে 'গ্রামীণফোন ট্যুরিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ল্যাব' স্থাপন ।

- জিওলজি বিভাগের ল্যাবরেটরি নির্মাণে শেভরন কোম্পানির অর্থায়ন। ফার্মেসি অনুষদে বিকন কোম্পানির অর্থায়ন ।

- ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদে আকিজ গ্রুপের ফুডকোর্ট নির্মাণ। রবির আর্থিক সহায়তায় 'বিদ্যানহর' ঝরনা ও 'ই-লাইব্রেরি' স্থাপন ।

- 'মুক্তি ও গণতন্ত্র' তোরণ নির্মাণে এনসিসি ব্যাংকের অর্থায়ন। ন্যাশনাল পলিমার ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের সহায়তায় শামসুন নাহার হলের স্পটলাইট স্থাপন, ওয়াই-ফাই জোন, আটটি সিসি ক্যামেরা স্থাপন, ফটো কর্নার নির্মাণ, বারান্দার সৌন্দর্য বৃদ্ধি, রিডিংরুম নির্মাণ।

এছাড়াও সম্প্রতি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে মেঘনা গ্রুপ দুটি বাস ও দুটি মাইক্রোবাস দিয়েছে। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে লাফার্জ সুরমার অর্থায়নে মুক্তমঞ্চ, ওয়াজেদ আলি ফাউন্ডেশনের অর্থায়নে আইআইসিটি ভবন নির্মিত হয়েছে। বাকৃবিতে আমেরিকান ডেইরি লিমিটেড (এডিএল) ও বাকৃবির মধ্যে এক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এডিএল বাংলাদেশের গবাদি পশুর কৌলিন মান উন্নয়নে জেনেটিক মানের কাজ শুরু করেছে। এই কাজে কারিগরি সহায়তাসহ গবেষণা কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে বাকৃবির বিজ্ঞানীদের সঙ্গে একত্রে কাজ করার জন্য চুক্তিটি করা হয়। [প্রথম আলো, ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬]

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্পোরেট পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটলে এর ফলাফল কী? বাণিজ্যিক কোম্পানিগুলোর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য থাকে পণ্যের প্রচার এবং মুনাফা উপার্জন করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নামডাকের সাথে কোম্পানির নাম জড়ানো একটি সুনামের ব্যাপার। পাশাপাশি রয়েছে দীর্ঘমেয়াদি লাভ। শিক্ষার্থীদের সামান্য সুবিধা দিলে তাদের সাথে কোম্পানির একাত্মতা গড়ে ওঠে। এরা তখন তাদের ভোক্তা এবং পণ্য বিক্রির বড় বাজার। কিছু কোম্পানি কিছু বিভাগের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা শেষের আগেই চাকরির সুযোগ করে দেয় (যেমন–ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ, ফার্মেসি বিভাগ)। ক্যাম্পাসে কোম্পানি যেমন প্রচারণা চালায়, তেমনি শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে কাজে লাগায়। যেমন–বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতা করে ব্যবসার জন্য নতুন পরিকল্পনা বের করে আনে, ছাত্রদের দিয়ে বিজ্ঞাপনের আইডিয়া খুঁজে বের করে, বিজ্ঞাপনে অভিনয় করায়। এভাবে চলতে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক প্রয়োজনে জ্ঞানচর্চার জায়গাটা আর থাকে না। কোম্পানির ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় মানুষ তৈরি করাই কাজ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে কর্পোরেট পুঁজির স্বার্থের সাথে বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত হয়ে যায়। ধীরে ধীরে ব্যাপারগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর হস্তক্ষেপের পর্যায়ে চলে যায়, যার স্পষ্ট ইঙ্গিত কৌশলপত্রেও বিদ্যমান। যেমন–সেখানে উলেখ আছে, গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা গবেষণাকে বাজারমুখী হতে হবে (কৌশলপত্র ২০০৬ : ২৮, অংশ ২, অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ৮.৩)। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের স্বাধীনভাবে গবেষণার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

শুধু বাজারের প্রয়োজন দেখলে কী পরিণতি হয় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ Land-grant এর অন্তর্ভুক্ত মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ। Food and Water Watch প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে বীজের উন্নয়ন, গাছপালার বৈচিত্র্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের কৌশল, সংরক্ষণের পদ্ধতি, চাষাবাদ পদ্ধতির উন্নয়নসহ নানা বিষয়ে গবেষণা হয়েছে। পুরো কৃষি খাতে এক ধরনের বিপবাত্মক পরিবর্তন ঘটতে থাকে। তখন রাষ্ট্রীয় বরাদ্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এরপর ১৯৮০ সালে Bayh-Dole Act পাস হয়। এ আইনের মাধ্যমে শিল্পপ্রতিষ্ঠানসমূহকে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা খাতে বিনিয়োগের সুযোগ করে দেয়া হয়, এই গবেষণার পেটেন্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠানের হাতে ছেড়ে দেয়া হয় এবং রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ কমিয়ে বেসরকারি বিনিয়োগ বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়। শিল্পপ্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ বাড়ার সাথে সাথে গবেষণার বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী গবেষণাকর্ম ব্যবহার হতে থাকে। এমনকি স্পন্সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী গবেষণার ফলাফল, বিষবয়স্তু, পদ্ধতিসমূহ তৈরি হতে থাকে। যেমন–National Soft Drink Association এর সহযোগিতায় পরিচালিত গবেষণার ফলাফল এমন এলো যে কোমল পানীয় গ্রহণের সাথে স্কুলের শিশুদের স্থূলতা বৃদ্ধির কোনো সম্পর্ক নেই। Egg Nutrition Center এর

অর্থায়নে পরিচালিত গবেষণা এই সিদ্ধান্তে এলো যে অতিরিক্ত ডিম খেলে রক্তে কলেস্টেরলের পরিমাণ বাড়ে না। আজ আমাদের দেশেও কোনো একটা সিমেন্ট কেম্পানির জন্য 'বুয়েট কর্তৃক পরীক্ষিত' কিংবা খাবারের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের স্বীকৃতি একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

HEQEP : ঋণের বোঝা, অর্থমুখি উন্মাদনা

বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে HEQEP (Higher Education Quality Enhancement Project) অর্থাৎ উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চালু করা হয়েছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে ইউজিসিকে। উচ্চশিক্ষার ২০ বছর মেয়াদি কৌশলপত্র বাস্তবায়ন করতেই HEQEP চালু করা হয়েছে। HEQEP এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে–

১. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান ও গবেষণার পরিবেশের মান ও সংগতি রক্ষা করা।

২. উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা। তিনটি উপায়ে এই সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে–

ক. প্রাইভেট ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় উভয়ের জন্য তহবিল ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি গ্রহণে সহায়তা করা।

খ. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।

গ. বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং।

এবিষয়ে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার মান উন্নয়ন ও বিনিয়োগের পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে HEQEP এর মাধ্যমে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রকল্পের বরাদ্দ সম্পর্কে বলা হয়েছে, ৬১ শতাংশ শিক্ষা ও গবেষণার মান বৃদ্ধি, ৩০ শতাংশ ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং এবং বাকি ৯ শতাংশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সামর্থ্য বৃদ্ধির কাজে এবং ০.৭৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জ বাবদ ব্যয় হবে। এই প্রকল্পের অধীনে সকল কার্যক্রম বিশ্বব্যাংকের নীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে" (১৭ মার্চ ২০০৯)।

রাষ্ট্র যাতে বিশ্ববিদ্যালয়কে পর্যাপ্ত ও প্রয়োজনীয় বরাদ্দ দেয়, কিন্তু কোনো রকমের প্রভাব খাটাতে না পারে সে কারণেই মঞ্জুরি কমিশনের সৃষ্টি। আর সেখানে বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানকে ডেকে আনা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় ব্যাপারে নাক গলানোর জন্য। বিশ্বব্যাংক স্পষ্ট করেই বলেছে, উচ্চশিক্ষাকে এমন জায়গায় নিতে হবে, যাতে বিনিয়োগের পরিবেশ তৈরি হয়, যাতে দেশি-বিদেশি প্রতিষ্ঠান এখান থেকে বিনিয়োগের মাধ্যমে লাভ তুলে নিতে পারে। শুধু বাংলাদেশে নয়, সারা দুনিয়ায় বিশ্বব্যাংক এই কাজ করে। তাদের প্রধানত তিনটি লক্ষ্য–LPG (Liberalisation, Privatisation, Globalisation), অর্থাৎ পুঁজির জন্য উদারীকরণ, বেসরকারীকরণ ও বিশ্বায়ন। বিশ্বব্যাংকের এই নীতির কারণে যেসব দেশ তাদের কাছ থেকে ঋণ নেয়, ঋণের শর্তই থাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রীয় বরাদ্দ কমানোর। এতে লাভ হয় পুঁজিপতিদের। নয়া উদারনীতিকরণের মূলকথাই হচ্ছে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ সমস্ত মৌলিক অধিকারকে বাজারের হাতে ছেড়ে দিতে হবে। সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি সমস্ত দেশে অনুপ্রবেশ করতে পারবে। নয়া উদারীকরণের এই নীতির কারণেই ১৯৯০ সালের পর থেকে এই বাণিজ্যিকীকরণ ব্যাপকতা পেয়েছে। বিশ্বব্যাংকসহ বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানের হস্তক্ষেপ বেড়েছে। কিন্তু এই হস্তক্ষেপ সাধারণ মানুষের জন্য কোনো সুফল বয়ে আনেনি। আমাদের দেশে বিশ্বব্যাংকের সুপারিশে পাটশিল্প বিপর্যস্ত হয়েছে, রাষ্ট্রীয় পাটকল আদমজী বন্ধ হয়েছে। এর ফলে বহু বেসরকারি কোম্পানি পাটজাত পণ্যের বদলে অন্যান্য পণ্য মানুষের কাছে বিক্রির সুযোগ পেয়েছে। একই ঘটনা এখন ঘটছে দেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে। আরেকটি বিষয় উলেখযোগ্য, বিশ্বব্যাংক HEQEP এর মাধ্যমে যে টাকা দিচ্ছে তা ঋণ হিসেবে পাওয়া। পুরো টাকাটাই শোধ দিতে হবে। অর্থাৎ ঋণটা দেশের সাধারণ মানুষের কাঁধেই চাপবে।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তার পরও কি এই ঋণ থেকে ভালো কিছু উঠে আসতে পারে না? কেননা গবেষণার জন্য তো রাষ্ট্র বরাদ্দ করছে না। HEQEP এর টাকায় যদি ভালো কিছু হয় তো খারাপ কী? আমরা স্পষ্টভাবে বলতে চাই যে এভাবে ভালো কিছু হওয়া সম্ভব নয়, ভালো কিছু হচ্ছেও না। তা বিগত সময়ে প্রকল্পের অগ্রগতি দেখলেই বোঝা সম্ভব। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০১০-১১ শিক্ষাবর্ষে দুই দফায় ১৭টি প্রকল্প নিয়ে HEQEP এর যাত্রা শুরু। মোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে ২৪ কোটি ৫২ লাখ ৯০ হাজার টাকা। ইংরেজি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, উদ্ভিদবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিভাগে HEQEP প্রকল্প চালু রয়েছে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে চার কোটি ৩৫ লাখ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। লক্ষ্য ছিল পুরো বিশ্ববিদ্যালয় অটোমেশন করা, একটি আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স ল্যাব চালু করা, বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ডিজিটাইজ করা এবং পুরো বিশ্ববিদ্যালয়কে বেশি গতিসম্পন্ন ইন্টারনেটের আওতায় আনা। কিন্তু এর কোনোটিই হয়নি। শুধুমাত্র শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তাদের নিয়ে কয়েকটি ওয়ার্কশপ হয়েছে, সাত দিনব্যাপী ফ্রি ট্রেনিংয়ের আয়োজন করা হয়েছে। শিক্ষকদের অর্থকেন্দ্রিক ব্যস্ততা বেড়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলমান কিছু গবেষণার বিষয়বস্তু হচ্ছে নিম্নরূপ–

- Modernization of class and conference rooms by using latest tools and techniques.
- Basic campus network sub project.
- Professional skill development of Psychology graduate.
- DU campus television.
- An evaluation of monetary policy in Bangladesh.
- Digitization of handwritten manuscripts, old news papers and rare collection of Dhaka University.

শিরোনামগুলো দেখলেই বোঝা যায় গবেষণার বিষয়বস্তু! সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ এজেন্ডার সাথে মিল রেখে কারিগরি কিছু বিষয় ছাড়া এর মধ্যে মৌলিক গবেষণা বলে কিছু নেই, যা আরও কম ব্যয়ে করা সম্ভব ছিলো। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, মাইক্রোবায়োলজিসহ কয়েকটি বিভাগে HEQEP চালু রয়েছে। উলেখ করার মতো যা হয়েছে তা হলো কয়েকটি সেমিনার করা, রুমে এসি লাগানো, ল্যাবের যন্ত্রপাতি কেনা, চেয়ার কেনা, পর্দা কেনা ইত্যাদি।

সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হলো, এই কাঁচা টাকা শিক্ষকদের মনোযোগ নষ্ট করছে, নৈতিকতাকে ধসিয়ে দিচ্ছে। প্রজেক্ট পাওয়া না পাওয়া নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যেও রেষারেষি তৈরি হচ্ছে। একাডেমিক কাউন্সিলেও HEQEP এর টাকা কোথায় কিভাবে ব্যয় হচ্ছে তা নিয়ে আলোচনা হয় না, ফলে কোনো জবাবদিহি নেই। কোন বিভাগ প্রজেক্ট পাবে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে। কতটা নোংরামি হতে পারে তার

প্রমাণ পাওয়া গেল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগে নাইট কোর্স ও HEQEP এর টাকা ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে রেষারেষিতে সম্প্রতি বন্ধ ছিল একাডেমিক কার্যক্রম (মার্চ ২২, ২০১৭, বাংলানিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম)। আরেকটি উলেখযোগ্য ব্যাপার হলো, নতুন এসি, ল্যাব বা ক্লাসরুমের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য নতুন ব্যয়ের খাত তৈরি করা হচ্ছে, যা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেই আদায় করা হবে। এতে করে শিক্ষাব্যয় ক্রমাগত বাড়বে।

চাকরিমুখী পড়াশোনার জোয়ার, তবু এত বেকার কেন?

বাজারমুখী কিংবা চাকরিমুখী শিক্ষার রব উঠেছে বহুদিন আগে থেকেই। একদল তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর বেকারদের জন্য মায়াকান্নার শেষ নেই। তাঁদের মতে, উচ্চশিক্ষার মৌলিক বিষয়গুলো শুধু বেকার তৈরি করছে। তাই বাজারের চাহিদার ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে। এখন প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগে বিভাগে এই জরিপকাজ পরিচালিত হচ্ছে। ছাত্র, শিক্ষক, Academic and non-academic staff, প্রাক্তন শিক্ষার্থী, চাকরিদাতা–এদের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহের কাজ চলছে। বিভাগের পড়াশোনার মান, গবেষণা, শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি, সিলেবাসের বিষয়বস্তু, চাকরি বাজারের সুযোগ কেমন, চাকরিতে কী ধরনের সফলতার পরিচয় দিতে পারছে, কিংবা পারছে কি না–এ বিষয়গুলোর ওপর মতামত সংগ্রহ চলছে। কৌশলপত্রে এই প্রক্রিয়াকে বলা হচ্ছে Self assessment. এর মূলকথা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাকে বাজারমুখী করতে হবে এবং ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন মেটাতে হবে। এসব দেখভালের জন্য Accreditation Council নামের প্রতিষ্ঠান থেকে নিতে হবে স্বীকৃতি। প্রশ্ন হলো, শিক্ষাকে বাজারমুখী, কর্মমুখী করে কি এর বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব? সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড এমপয়মেন্ট রিসার্চ নামের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাদের সমীক্ষায় দেখাচ্ছে, বর্তমানে উচ্চশিক্ষিত বেকারের হার ১৬.৪ শতাংশ। দেশের বেকার সমস্যা কি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি সৃষ্টি করেছে? বরং গত ১০ বছরে তো বিশ্ববিদ্যালগুলোতে বাজারমুখী শিক্ষাকেই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।

আদতে বেকার সমস্যার মূল কারণ নিহিত আছে সমাজের অর্থনীতিতে, যা রাষ্ট্র সব সময় আড়াল করে। প্রচলিত পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল সংকটের নাম বাজার সংকট। এখানে আর্থিক সামর্থ্য না থাকলে কেউ বাজারের কোনো পণ্য কিনতে পারে না। তাই বাজারে পণ্য থেকে যায়। এই বাজার ব্যবস্থায় সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনই একমাত্র লক্ষ্য, সেখানে সমাজ বা মানুষের প্রয়োজন গৌণ। সস্তা শ্রমকে কাজে লাগিয়ে সর্বোচ্চ মুনাফার জন্য খুব সামান্য পরিমাণ এবং লাভজনক ক্ষেত্রে শিল্পায়ন ঘটে। এ কারণে একদিকে সমাজের সব মানুষের প্রয়োজন মেটে না, অন্যদিকে উৎপাদনের বন্ধ্যাত্ব বিদ্যমান থাকে। নতুন নতুন শিল্প-কলকারখানা তৈরি হয় না। তাই এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় চাইলেও সবার চাকরি জোটে না। আর কর্মসংস্থান তৈরি করতে হলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে নতুন শিল্প-কারখানা নির্মাণ করাই হলো সমাধান। এটা সরকারের দায়িত্ব, কিন্তু উচ্চশিক্ষার ওপর বেকারত্বের দায় চাপিয়ে সরকার জনগণকে বিভ্রান্ত করে।

তাই বাজারের কী চাহিদা তা দিয়ে উচ্চশিক্ষার বিষয়বস্তু নির্ধারিত হতে পারে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগের সৃষ্টির সাথে বিশ্বজ্ঞান সৃষ্টির গতিপথ ও ইতিহাস যুক্ত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোনো শাখা বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের একটা পর্যায়ে সেই বিষয়ে বিভাগ খোলা সম্ভব এবং তার ওপর গবেষণা করা সম্ভব। বাজারের নিয়মে বিশ্ববিদ্যালয়কে চালানোর চেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয়কে তার দর্শনগত জায়গা থেকেই সরিয়ে আনবে। এই Self assessment Ges Accreditation Council এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে বাজারী ছাঁচে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা চলছে। বিশ্ববিদ্যালয়কে তারা শুধুমাত্র তাদের প্রয়োজনীয় কর্মচারী তৈরির কাজে লাগাতে চায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অংশটুকু জ্ঞানের, যে অংশটুকু দায়বোধের তাকে অপ্রয়োজনীয় ঘোষণা দিয়ে বন্ধ করতে চায়।

আমব্রেলা অ্যাক্ট আর উচ্চশিক্ষা কমিশন

'চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির, জ্ঞান যেথা মুক্ত'–জ্ঞানচর্চার জন্য এমনই মুক্ত স্বাধীন পরিবেশ প্রয়োজন। ২০০৬ সালের জুলাই মাসে ইউজিসি দেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের জন্য আমব্রেলা অ্যাক্টের প্রস্তাব করে। এ আইনের প্রধান বিষয়ই হলো মঞ্জুরি কমিশনের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা খর্ব করা। আমব্রেলা অ্যাক্টের সেকশন ৮/২-তে বলা হয়েছে, 'এই আইন অনুসারে ইউজিসির এর নীতিমালা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে বিরোধ তৈরি হলে ইউজিসিকেই অগ্রগণ্য ধরতে হবে।'

এই আইন অনুসারে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হবেন রাষ্ট্রপতি। আচার্যের নেতৃত্বে সার্চ কমিটির মাধ্যমে উপাচার্য এবং উপ-উপাচার্য নিয়োগ দেয়া হবে। সিনেট, সিন্ডিকেট, সিলেকশন বোর্ডসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর্ষদসমূহে সরকার মনোনীত ব্যক্তিদের আধিক্য থাকবে। সাধরণভাবে আমাদের দেশে রাষ্ট্রপতি হন দলীয় কোনো ব্যক্তি এবং বিভিন্ন সময়ে সামরিক শাসকদেরও রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার নজির আছে। এই আইন অনুসারে উচ্চশিক্ষার সাথে সম্পর্কহীন কিন্তু দলীয়ভাবে ক্ষমতাধর ব্যক্তিরাই আচার্য হবেন। এবং সাথে সাথে উপাচার্যকেও দলীয় আনুগত্যের ঝাণ্ডাধারী হতে হবে। কী মর্মান্তিক! যেখানে বিদগ্ধ শিক্ষাবিদদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বে থাকার কথা, সেখানে দলকানা ব্যক্তিরাই আজকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ আসনগুলো দখল করে আছে!

স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৭৩ এর মাধ্যমে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেয়া হয়। এই অধ্যাদেশে অনেক দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও স্বাধীনতার পর এটিই ছিল তুলনামূলক অর্থে প্রগতিশীল। কিন্তু অন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এবং পরবর্তীতে যতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার কোনোটিকেই এর আওতায় আনা হয়নি। বর্তমান সময়ে এই স্বায়ত্তশাসনের ধারণাকে আরো বেশি সংকুচিত করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, ২০১০ সালের শিক্ষানীতিতে ৩৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় এবং ৭৮টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়কে একত্রে নিয়ন্ত্রণের জন্য অধিকর্তারূপে উচ্চশিক্ষা কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়। উচ্চশিক্ষা কমিশন সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, সবগুলো পাবলিক-প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এটি হবে একটি নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ওপর নজরদারি চালানো হবে। কমিশনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নীতিমালা, বিধি, প্রবিধি ও স্ট্যাটিউটস প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়নের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়, এই কমিশন উচ্চশিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের আরো ভয়ংকর বিপদ ডেকে আনবে।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন, হল দখলদারিত্ব এবং আবাসন সংকট

বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে হলের ধারণাটি একেবারে অবিচ্ছেদ্য বিষয়।

দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শিক্ষার্থীরা একসাথে থাকবে, একে অপরের থেকে শিখবে। অথচ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সামান্য আবাসিক সুবিধা দিতেও সরকার কার্পণ্য দেখায়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে তো ১২ বছর ধরে হল নির্মাণ নিয়ে সরকার টালবাহানা করছে। দেশের সমস্ত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্র ৩২ শতাংশ শিক্ষার্থী আবাসিক সুবিধা পায়, ৬৮ শতাংশ শিক্ষার্থী সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। হল সম্পর্কে ইউজিসির কৌশলপত্রে স্পষ্টতই উলেখ আছে, আবাসিক হল ছাত্ররাজনীতির ক্ষেত্র তৈরি করছে (কৌশলপত্র ২০০৬, Executive Summary অংশ)। বলা হয়েছে. 'আবাসিক হল সন্ত্রাসীদের আখড়া।' এ কথা বলে হল সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা, অস্বীকার করা হয়েছে আবাসনের প্রয়োজনীয়তা। বিশ্ববিদ্যালয়ে যতটুকু আবাসিক সুবিধা আছে তা-ও দখল করে আছে ক্ষমতাসীন ছাত্রসংগঠনগুলো। বর্তমান প্রশাসন যেন হলগুলো ছাত্রলীগকে ছেড়ে দিয়েছে। হলে উঠতে গেলে ছাত্রলীগের ভাইদের সাথে বোঝাপড়ার মাধ্যমেই উঠতে হয়। ক্যাম্পাসে, হলে, ক্লাসরুমে–সব জায়গায় যেন বাধ্যবাধকতার পরিবেশ। ক্লাসরুমে শিক্ষকের পড়ানো, তত্ত্বাবধান নিয়ে একজন শিক্ষার্থী কোনো কথা বলতে পারে না। নাইট কোর্স, ফি বৃদ্ধি নিয়ে প্রতিবাদ করতে পারে না। কেননা শিক্ষকদের হাতে রয়েছে 'মার্কসের' ক্ষমতা। ক্লাস টেস্ট, প্রেজেন্টেশন, অ্যাসাইনমেন্ট, অ্যাটেন্ডেন্স ইত্যাদি মিলে একজন শিক্ষকের হাতে আছে শতকরা ৩০ নম্বর, ক্ষেত্রবিশেষে ৪০ নম্বর। ব্যক্তিগত আক্রোশে এই ক্ষমতা ব্যবহারের নজির আছে অনেক।

এমন অগণতান্ত্রিক পরিস্থিতি কিছুটা পাল্টাত যদি শিক্ষার্থীরা তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ পেত। তখন ক্ষমতাসীনরা চাইলেই এভাবে নির্বিচারে তাদের ওপর দমন-পীড়ন চালাতে পারত না। কিন্তু কোনো বিশ্ববিদ্যালয়েই ২৭ বছর ধরে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয়নি। ফলে নেতৃত্ব গড়ে তোলার কোনো সুস্থ প্রক্রিয়া চালু নেই। কোনো রাজনৈতিক তর্ক-বিতর্ক নেই। সংগঠনের নেতাদের ছাত্রদের কাছে কোনো জবাবদিহিতা নেই। বিশ্ববিদ্যালয় যে কেবল পড়াশোনার জায়গা নয়, গণতান্ত্রিক মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণতা নিয়ে বেড়ে ওঠা, তা যেন ভুলতে বসেছে শিক্ষার্থীরা। ছাত্র সংসদ নির্বাচন থাকলে একজন শিক্ষার্থীকে প্রতিটি ছাত্রসংগঠনের শিক্ষার দাবি, দেশের পরিস্থিতি নিয়ে তাদের বক্তব্য কী–এগুলো নিয়ে ভাবতে হতো, জানতে হতো। কিন্তু এই প্রক্রিয়াগুলো সম্পূর্ণ অনপুস্থিত বলে রাজনীতি-সচেতনতাও তাদের মধ্যে গড়ে উঠছে না। ফলে তাদের অবস্থান দাঁড়িয়ে গেছে দেশের পরিস্থিতি থেকে বিচ্ছিন্ন সীমাবদ্ধ জায়গায়। কৌশলপত্রেও ছাত্ররাজনীতিকে নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে সীমাবদ্ধ (Limit) রাখার প্রস্তাব রয়েছে।

স্বায়ত্তশাসন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বাধাহীন জ্ঞানচর্চা অসম্ভব

শ্বাস-প্রশ্বাস না নিলে যেমন প্রাণী নয়, ঠিক তেমনি স্বায়ত্তশাসন ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় অসম্ভব। মানব সভ্যতার ইতিহাসও এ কথাই প্রমাণ করে যে জ্ঞানচর্চা কখনো রুদ্ধ পরিবেশে সম্ভব নয়। জ্ঞানকে সমাজপতিদের রক্তচক্ষু আর অতীতের প্রথাকে উপেক্ষা করেই বিকশিত হতে হয়। সেই অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপবের মধ্য দিয়ে জ্ঞানচর্চার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে ধর্মীয় তথা সমাজপতিদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার আকাঙ্ক্ষা তৈরি হলো। নতুন চিন্তা এলো যে সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বিদ্যমান সমাজব্যবস্থাকে প্রশ্ন করতে হবে, উত্তর খুঁজতে হবে–যা কখনোই সমাজের সকল কিছুর প্রতি আনুগত্য রেখে সম্ভব নয়। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছু একাডেমিক প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করতে হয়। যেমন–বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রের যোগ্যতা নিরূপণ, শিক্ষক (উপাচার্যসহ)-কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং ডিগ্রির মাপকাঠি নির্ধারণ, শিক্ষণ-প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি। একমাত্র স্বায়ত্তশাসন থাকলেই এ কাজগুলো বাধাহীনভাবে করা সম্ভব।

আমরা দেখছি, দুনিয়াব্যাপী বাজার সংকটের কারণে শিল্প-কারখানার চেয়ে শিক্ষায় বিনিয়োগ এখন খুবই লাভজনক। সে জন্য কৌশলপত্রের ছত্রে ছত্রে আছে স্বায়ত্তশাসন হরণের পরিকল্পনা। এর ফলে ধ্বংস হচ্ছে অনেক আত্মত্যাগ ও সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত এ দেশের সাধারণ মানুষের সন্তানদের শিক্ষার অধিকার।

আমাদেরই দায়িত্ব

বিশ্ববিদ্যালয় হলো সমাজ-সভ্যতার বাতিঘর। অনেক হতাশা, অন্ধকারের মাঝেও সে মানুষকে পথ দেখায়। অতীতে এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয় সে ভূমিকা রেখেছে, অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেনি। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ধূলিকণায় লেখা আছে মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতার ইতিহাস। বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্ঞান পূর্বসূরিদের অক্লান্ত সংগ্রামের ফসল। এর ওপর কোনো ব্যক্তির লাভালাভ যুক্ত করা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অবকাঠামো তৈরি করেছে শ্রমিকেরা, আর বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করার প্রতিমুহূর্তের ব্যয় তা-ও আসে দেশের শ্রমিক-কৃষকসহ সাধারণ মানুষের ট্যাক্সে টাকা থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরই তাই হতে হবে সবচেয়ে দায়বদ্ধ মানুষ। সর্বব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে শিক্ষার অধিকারের লড়াইএ মূল ভূমিকা তাঁদেরই।

নাঈমা খালেদ মনিকা: সভাপতি, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট
ইমেইল: studentfront1984@gmail.com

[লেখাটি সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্টের মুখপত্র 'অনুশীলন'-এর, এপ্রিল ২০১৭, এর সংক্ষেপিত রূপ।]

তথ্যসূত্র

১. হুমায়ুন আজাদ "বিশ্ববিদ্যালয় ও স্বাধীনতা" ঢাকা, ১৯৯৯
২. Strategic Plan for Higher Education in Bangladesh : 2006-2026, published by University Grants Commission of Bangladesh, January 2006
৩.www.foodandwaterwatch.org/news/public-research-private-gain-corporate-influence-over-university-agricultural-research, april 2012 Food and Water Watch.

সুন্দরবনের প্রহরী
শিল্পী: মিতা মেহেদী